গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা | ২৬ জুলাই - ১ আগস্ট ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মালদহে বিদ্যুৎ-গ্রাহকদের উপর পুলিশের গুলি

রাজ্য সরকারের জনবিরোধী চরিত্রেরই প্রকাশ

মালদহে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ১৮ জুলাই পুলিশের গুলি চালানোর তীব্র নিন্দা করেছেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) -এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। ওই দিনই এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মালদহের মানিকচকে লাগাতার বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বিপর্যস্ত মানুষের পথ অবরোধে পুলিশের গুলি চালানোর তীব্র নিন্দা করছি। পুলিশের এই গুলি চালনা রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী চরিত্রকেই প্রকাশ করেছে। আমরা অবিলম্বে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষী পুলিশদের শাস্তি ও আহতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এলাকায় বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান দাবি করছি।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, বিস্তীর্ণ মফঃস্বল এলাকা জুড়ে লাগাতার লোডশেডিং, প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালু করা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ১৮-২৪ জুলাই 'প্রতিবাদ সপ্তাহ' পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শহর, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজারে এই প্রতিবাদে সামিল হওয়ার জন্য আমরা রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

ভিতরের পাতায়

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে পৃষ্ঠা ৩
সরকার স্বার্থ দেখছে কর্পোরেটের পৃষ্ঠা ৭

এ ভাবেও বুক চিতিয়ে বুলেট আহ্বান করা যায়!

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনকে অভিনন্দন

এ ভাবেও লড়া যায়! এমন নির্ভয়ে বুক পেতে বুলেট আহ্বান করা যায়! বাংলাদেশের ছাত্রদের কুর্নিশ। তোমরা এই শতাব্দীর লড়াইয়ের রক্তমাখা পথ দেখিয়ে গেলে ভাই!

দু'হাত ছড়িয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মৃত্যুকে আহ্বান করছেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কোটা সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলনের নেতা আবু সাঈদ— এই ছবি সারা দুনিয়ার প্রতিবাদী মানুষের বুকে এঁকে রেখে গেছে এক স্থায়ী রেখা। যে লড়াই তাঁরা লড়েছেন, মানুষের পরিচয় এতটুকুও বহন করলে তাঁদের কুর্নিশ জানাতেই হবে।

২১ জুলাই পর্যন্ত সংবাদ সংস্থা এএফপি পুলিশ এবং শাসক দলের কর্মীদের আক্রমণে অন্তত ১৫১ জনের মৃত্যুর খবর জানালেও আন্দোলনকারী ছাত্ররা জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা তিনশোর বেশি।

১৪ জুলাই থেকে অতি দ্রুত সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভের রূপ নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, জাহাঙ্গির নগর, সিলেটের শাহজালাল, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলনে যোগ দেন। মেয়েরাও দলে দলে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পথে নামেন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের ঠেকাতে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসগুলি বন্ধের নির্দেশ দেয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ডাক দেন ১৯ জুলাই থেকে চলবে 'কমপ্লিট শাট ডাউন'। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলেন। এই দাবি তরঙ্গ তুলে গোটা দেশে জনগণের

চারের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে ভারতের ছাত্ররা। ১৯ জুলাই দিল্লি ও ১৮ জুলাই কলকাতা

মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারকে বাধ্য করতে

চাই ব্যাপক গণআন্দোলন

আলু, সব্জি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম লাগামছাড়া। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চুপ করে থেকে তা চলতে দিচ্ছে। কারও কারও প্রশ্ন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী-ই বা করতে পারে? কেউ কেউ মনে করেন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সরকারের বিশেষ কিছু করার নেই। অনেকে মনে করেন, মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতির বিষয়, বাজারের নিয়মে তা ওঠা নামা করে। এখানে সরকারের করণীয় কিছু নেই। তাদের এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে এ ব্যাপারে পূর্বতন কংগ্রেস ও সিপিএম সরকারের নিশ্চেষ্ট ভূমিকা দেখে। এই দুটি সরকারকেও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কোনও ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। ফলে বিরামহীন ভাবে বেড়েই চলেছে জিনিসপত্রের দাম। যদিও এর বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদও চলছে। সরকারের কাছে অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানাচ্ছে এস ইউ সি আই (সি)-র মতো দল। কিন্তু সরকার কোনও ভূমিকাই নিচ্ছে না।

মূল্যবৃদ্ধি পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। অতি মুনাফার লক্ষ্য থেকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির উৎপাদক, পরিচালকরা জিনিসপত্রের দাম মাত্রা ছাড়া বাড়ায়। পুঁজিবাদী সরকারও নানা ভাবে মদত দিয়ে থাকে মূল্যবৃদ্ধিতে। ফলে কারণে-অকারণে বছরভর একটু একটু করে জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। অল্প অল্প বৃদ্ধি মানুষ সব সময় খেয়াল করে না। কিন্তু যখন মূল্যবৃদ্ধি মাত্রাছাড়া হয়, তখন তা জনগণের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই মূল্যবৃদ্ধিটা যদি চাল ডাল শাক-সবজি তেল নুন ইত্যাদি খাদ্যপণ্যে ঘটে থাকে, তা হলে তার অভিঘাতটা হয় মারাত্মক।

দুয়ের পাতায় দেখুন

স্নাতক স্তরে ভর্তিতে জটিলতা

প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

স্নাতক স্তরে অভিন্ন পোর্টালে ভর্তিতে আসন বরাদ্দ থাকার পরেও ৬০ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারেননি। ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করছে। এর বিরুদ্ধে ২১ জুলাই এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় এক বিবৃতিতে বলেন,

উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের দীর্ঘদিন পর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এর সাথে মিলেছে অভিন্ন পোর্টালে ভর্তিতে বিভিন্ন জটিলতা, টেকনিক্যাল সমস্যা, উচ্চমাধ্যমিকের রিভিউয়ের রেজাল্ট দেরি করে পাওয়া। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে ভর্তিতে অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় বহু ছাত্রছাত্রী বেসরকারি কলেজে বেশি টাকা দিয়ে ভর্তি

চারের পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে

৫ আগস্ট

সমাবেশ

SUCI (C)

বক্তা - কমরেড প্রভাস ঘোষ ● সভাপতি - কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী ● রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, কলকাতা ● বেলা ২টা

জেসিআই দফতরে পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি

পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৩ হাজার টাকা কুইন্টালের দাবিতে জেসিআই-এর সর্বভারতীয় দফতরে স্মারকলিপি দিল সারা বাংলা পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি। ১৮ জুলাই সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল জেসিআই-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে স্মারকলিপি দেন (ছবি)। স্মারকলিপিতে পাট চাষিদের দুরবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়, পাটের উৎপাদন খরচ যেখানে কমপক্ষে ৯ হাজার টাকা কুইন্টাল, সেখানে সরকারি সহায়ক মূল্য ৫৩৩৫ টাকা হয় কোন হিসাবে! এ তো বাস্তবে পাট চাষিদের ঋণগ্রস্ত করে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া! এ দিন পাট চাষের কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন খরচের একটা তালিকা তুলে ধরা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, আজ পাট চাষিদের চরম সংকটের জন্য দায়ী সরকারি নীতি। পাট চাষ পরিবেশবান্ধব। তাই, বর্তমান বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে পাট চাষের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। পাট চাষিদের বাঁচাতে সরকারের অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

হাওড়ায় জমা জলের সমস্যা সমাধানের দাবি

৫০০ বছরের পুরনো শহর হাওড়ায় এখনও পর্যন্ত কোনও আধুনিক জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাই বর্ষাকালে মানুষকে নোংরা পচা জলে হাবুডুবু খেতে হয়। এখানে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে পুকুর ও জলাশয় ভরাট করে এবং বন্ধ কলকারখানার জমিতে বহুতল আবাসন গড়ে ওঠায় এই সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। সমস্যার সমাধানে শিবপুর সিটিজেনস ফোরাম এলাকার কয়েকশো মানুষের সই সংগ্রহ করে ১২ জুলাই ৫ নং বরোর চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেয়। স্মারকলিপিতে ৩০ ও ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় জল জমার সমস্যা তুলে ধরা হয়। নেতৃত্ব দেন পদ্মলোচন সাহু, শ্রীরূপ দাস ও অম্বা গুইন।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান (সামশেরগঞ্জ) লোকাল কমিটির প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড প্রভাস চন্দ্র দাস ১৯ জুন ৮৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি কয়েক বছর যাবত বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে দলের নেতা-কর্মী সহ এলাকার বহু সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে এসে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড প্রভাস চন্দ্র দাস ষাটের দশকের শেষ দিকে তারাপুর কোম্পানির শ্রমিকদের নানা দাবিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রয়াত কমরেড অচিন্ত্য সিংহর সান্নিধ্যে এসে দলে যুক্ত হন। তার পর থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ৮০-র দশকে ভাষাশিক্ষা আন্দোলন, গঙ্গা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ভাঙন রোধের দাবিতে ১৯৮৮ সালে দলের উদ্যোগে 'গণ অধিকার রক্ষা কমিটি'র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একটা সময় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন এবং অত্যন্ত সততার সঙ্গে ভূমিকা পালন করেন, যা এলাকার মানুষের মনে তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসায়। দলের প্রতি তাঁর আবেগ, ভালবাসা ছিল অনুসরণীয়। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে এলাকায় দলের একটি স্টাডি ক্লাসের আয়োজন করা হয়। অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় দলের পক্ষ থেকে তাঁকে খবর দেওয়া হয়নি। মাইকের আওয়াজ শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে স্টাডি ক্লাস হচ্ছে। তাঁর তখন বসে থাকার মতো শারীরিক অবস্থা নেই। একটি ভ্যান ভাড়া করে তাতে শুয়েই তিনি স্টাডি ক্লাসে চলে আসেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকাবাসী হারাল তাঁদের অত্যন্ত আপনজনকে। পার্টি হারাল অত্যন্ত স্নেহশীল একজন অভিভাবককে।

কমরেড প্রভাস চন্দ্র দাস লাল সেলাম

মূল্যবৃদ্ধি রোধে চাই গণআন্দোলন

একের পাতার পর

তখন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের খুঁটিনাটি ভাল করে বোঝার প্রয়োজন হয়।

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, জনস্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েই সরকারি দলের এমএলএ-এমপিরা জনগণের ভোট নিয়েছেন। তা হলে সেই প্রতিশ্রুতি তাঁরা সরকারে বসে রক্ষা করবেন না কেন? এক শ্রেণির ব্যবসায়ী অতি মুনাফার জন্য জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটবে, তাদের অর্ধাহার, অপুষ্টির মধ্যে ঠেলে দেবে, আর সরকার এসব চুপচাপ দেখবে, এটাই কি সরকারের কাজ? সরকার এমন স্থবির হয়ে গেলে জনতরঙ্গের ধাক্কায় তাকে সক্রিয় করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকার কী করতে পারে? সরকারের যে কাজটি প্রথমেই করা উচিত তা হল, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে বেঁধে রাখার জন্য উপভোক্তা-বান্ধব আইন প্রণয়ন করা।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে চলছে বাজারে বাজারে প্রচার। তালতলা বাজার। কলকাতা

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অত্যাবশ্যক পণ্য আইন নামে একটি আইন ছিল। সেটি ২০২০ সালে মজুতদারদের স্বার্থে সংশোধন করা হয়েছে। পণ্য আইন (সংশোধন) ২০২০ অনুযায়ী, দানাশস্য, ডাল, তৈলবীজ, পেঁয়াজ ও আলুর মতো বেশ কিছু ভোজ্যসামগ্রীকে অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে মজুতদার চক্র এইসব সামগ্রী যথেচ্ছ মজুত করে একতরফা দাম বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এটা এখনই আইন করে বন্ধ করা উচিত। নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীগুলিকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। জনস্বার্থে এই আইনকে আরও কঠোর করা উচিত। সরকার চাইলে এ কাজ অনায়াসেই করতে পারে।

দ্বিতীয় যে কাজটি সরকার করতে পারে তা হল, গ্রামের হাট থেকে পণ্য কিনে শহরে আনা পর্যন্ত স্তরে স্তরে যে তোলাবাজি হয় তা বন্ধ করা। আনাজ কেনার সময় নানা কমিটি, সমিতির নামে মিডলম্যানদের কাছ থেকে তোলা আদায় হয়। বহু ক্ষেত্রে সরকারি আইন রক্ষকরা এই মিডলম্যানদের কাছ থেকে তোলা আদায় করে থাকে। রেলেও চলে তোলা আদায়। এতগুলি তোলা দেওয়ায় এবং তার সাথে মিডলম্যানদের দফায় দফায় মুনাফা যোগ হওয়ায় সবজির দাম হয়ে যায় মাত্রাছাড়া। এগুলি সরকার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

তৃতীয় যে কাজটি সরকার করতে পারে তা হল, কৃষিপণ্যের ফরওয়ার্ড ট্রেডিং বন্ধ করা। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ধীরে ধীরে চুক্তি চাষ চালু করে চলেছে। এই ব্যবস্থায় চাষের আগেই পুঁজিপতিরা কৃষকের ফসল কিনে নেয় এবং সেভাবেই চুক্তি হয়। এই কৃষি-পুঁজিপতিরাই আধুনিক মিডলম্যান। এরা খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারিগর। এদের আটকানো দরকার।

চতুর্থ এবং জরুরি যে কাজটি সরকার করতে পারে তা হল, খাদ্যপণ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন এবং আইন করে ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করা। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের কথা উঠলেই এক শ্রেণির পণ্ডিত বলতে শুরু করেন সরকারের কাজ কি ব্যবসা করা? তারা ভেবেই দেখে না বৃহৎ ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফার আগ্রাসন থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করা সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার যে অধিকার দেশবাসীর আছে, তা সুনিশ্চিত করা সরকারের কাজ নয়? আর সেটা করার জন্য যদি খাদ্যদ্রব্যে মজুতদারদের দখলদারি খর্ব করতে হয় এবং সে জন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য আনতে হয়, তা হলে সেটা তো গুরুত্ব দিয়ে করা উচিত। কেন তা নিয়ে বাহানা তোলা? মজুতদারদের কাছে একটা সরকার বিক্রি না হয়ে গেলে এটা করা তো তার উচিতই।

কিন্তু সরকার তা করছে না কেন? সরকার কেন নিষ্ক্রিয় থাকে? সরকার জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনগণের প্রতিষ্ঠান— বইয়ে এসব কথা থাকলেও বাস্তবে ভারতের মতো একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সরকার হল এই পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থারই পাহারাদার। পুঁজিপতি শ্রেণির সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করাই তার কাজ। ফলে সে নেহাত বাধ্য না হলে জনগণের জন্য কিছু করবে না। এখানেই রয়েছে শক্তিশালী গণআন্দোলনের ভূমিকা।

কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আগুনঝরা বাম আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। সেই আন্দোলনে লাঠি-গুলি চলেছে। সে সব উপেক্ষা করে মানুষ লড়েছেন। ১৯৯০ এর দশকে সিপিএমের আমলেও মানুষ মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়েছেন। লাঠি-গুলি চলেছে। বহু আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শহিদ হয়েছেন এস ইউ সি আই (সি)-র যুবকর্মী মাধাই হালদার। সেইসব আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী শাসনযন্ত্র ও তার নীতিগুলির কোনও পরিবর্তন হয়নি। ফলে আবারও মূল্যবৃদ্ধির ছোবল। মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারকে সক্রিয় করতে হলে আবারও আন্দোলনের প্রবল জোয়ারই তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সেই আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বেলদাতে বিক্ষোভ

জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম কমানোয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা, মোবাইলের মাশুল বৃদ্ধি, নিট ও নেট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে এবং উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ করা, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বন্ধ সহ নারায়ণগড় ব্লকের জীর্ণ রাস্তাঘাট সংস্কার, বেলদা কেশিয়াড়ি মোড়ে ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু করার দাবিতে এসইউসিআই(সি) পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি বেলদা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার জানা, জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সূর্য প্রধান সহ অন্য নেতারা।

বিপ্লব করতে হলে জনগণকে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিকে চিনতেই হবে

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৯তম স্মরণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য শিক্ষা থেকে একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

... এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটির জন্মের পর থেকে সংগ্রামের ইতিহাস, অর্থাৎ সংগ্রাম পরিচালনার কায়দা ও পরিচালনার সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে এবং দেশের মূল রাজনৈতিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করবার জন্য এই পার্টিটি যতবার মূল রণনীতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ মূল বিপ্লবী তত্ত্ব গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবং দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাত্যহিক আচরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত মান ... লক্ষ করে— এই দলটি যে গঠনের শুরু থেকেই কমিউনিজমের তকমা এঁটে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির মতো আচরণ করে এসেছে— এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই কেবলমাত্র আমরা ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল, অর্থাৎ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে তুলেছি। কারণ, মার্ক্সবাদ অনুযায়ী আমরা জানি, দল শুধুমাত্র কতগুলো ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যে কোনও রাজনৈতিক দলই কোনও না কোনও শ্রেণির দল। অর্থাৎ উৎপাদনের বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে একটি দেশে যে শ্রেণিগুলির অস্তিত্ব বর্তমান থাকে তার কোনও না কোনও একটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শগত ও নৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার রাজনৈতিক অস্ত্রই হচ্ছে সেই শ্রেণির রাজনৈতিক দল। তা হলে, দল বলতে মার্ক্সবাদীরা বুঝে থাকে শ্রেণি দল, যা একটা বিশেষ শ্রেণিগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চিন্তাগত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ওপরেই গড়ে উঠে, সে সম্বন্ধে দলের নেতা ও কর্মীরা সচেতন থাক বা না থাক, যেটা দলকে এবং দলের মূল বিচার-বিশ্লেষণকে এবং দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক আচরণের সংস্কৃতিগত ও রুচিগত দিকটিকেও প্রভাবিত করে চলেছে।

... একটি দেশে একটিই সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল বা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল গড়ে উঠতে পারে, একাধিক শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল থাকতে পারে না। যদি দেশের দুই প্রান্তে দু'টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, তা হলে দু'জনেরই মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য এক হওয়ার জন্য তারা উভয়েই মিলিত হয়ে গিয়ে একটি পার্টি গড়ে তুলবে। কমিউনিস্ট পার্টি নামে দেশের অভ্যন্তরে একটি পার্টি থাকা সত্ত্বেও সাম্যবাদের আদর্শে অপর একটি পার্টি গঠনের যৌক্তিকতা একমাত্র তখনই বর্তায় যদি ইতিহাস ও দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে দেখা যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টি নামে সেই বিশেষ দলটি শ্রমিক শ্রেণির নামের আড়ালে আসলে পেটিবুর্জোয়া বা বুর্জোয়া স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলেছে। সুতরাং, ভারতবর্ষে যে আট-ন'টি দল প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল বলে জাহির করছে, নিজেদের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলে প্রচার করছে, এদের প্রতিটিই কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারে না। তা হলে, হয় এদের মধ্যে যে কোনও একটি পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি, অথবা এদের কোনওটিই নয়। যদি এদের মধ্যে কোনও একটি দল সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল থেকে থাকে, আমাদের সেটিকে ইতিহাস ও সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে চিনে নিতে হবে।

আর, যদি সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যায়, দেশে এখনও সত্যিকারের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

দল গড়েই ওঠেনি, তা হলে যাঁরা বিপ্লব চান, যাঁরা বর্তমান অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সামাজিক অবিচার এবং সাংস্কৃতিক সংকটের হাত থেকে মুক্তি চান, শোষিত শ্রেণিগুলিকে তথা দেশকে মুক্তি দিতে চান, তাঁদের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে। কেন না, আজকের দিনে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল ছাড়া একটি দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলা যায় না, তাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না এবং বিপ্লবের পর তাকে সংহত করে শেষ পর্যন্ত শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজও গড়ে তোলা যায় না। ফলে, ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য, যে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাটি আমাদের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আমাদের বিকাশের পথটিকে, সমাজের অপ্রতিহত অগ্রগতির পথটিকেই রুদ্ধ করে বসে আছে তাকে ভেঙে ফেলে সমাজের অবাধ বিকাশের পথটিকে খুলে দেবার জন্য বিপ্লব আমাদের চাই এবং এই বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী দলও আমাদের চাই। আর, হাজারো রকমের বিপ্লবী (!) তত্ত্ব এবং প্রচারের ডামাডোলের ভিতর থেকেই, কাজটি যত কঠিন হোক না কেন, সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি কোনটি, সেটি আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

বিপ্লবী দল বিচারের সঠিক পদ্ধতি

এখন, একটি দল শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল কি দল নয়— এই জটিল বিচারটি করব আমরা কিসের সাহায্যে? সে কি দলের নেতাদের গরম গরম বিপ্লবী বুলি দিয়ে? তা হলে তো সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণির দল বিচারের কোনও উপায়ই থাকবে না! কারণ, বিপ্লবী বুলি আওড়াতে তো কেউই আমরা পিছিয়ে নেই। লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না এবং এই জন্যই একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে না। লেনিন যখন বলেছেন বিপ্লবী তত্ত্ব, তখন তিনি একটি দলের শুধু রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং পলিসি বোঝাতে চাননি, তিনি বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-অর্ডিনেট (সংযোজিত) করে একটি পুরো জ্ঞানের পরিমণ্ডলকেই (এপিস্টেমোলজিক্যাল ক্যাটাগরি) বুঝিয়েছেন। তা হলে, কোনও দল বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমত, দলটির বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে বিচার করে দেখতে হবে। দেখতে হবে, যে রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে তারা বিপ্লবী বলে প্রচার করছে তা আসলে বিপ্লবী কি না। অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী তত্ত্বটি আমাদের সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিপ্লবের যে জটিল প্রক্রিয়াটি চালু রয়েছে তার যথার্থ ও বাস্তব প্রতিফলন কি না। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে, দলটির আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব কোনও বিশ্লেষণ আছে কি নেই এবং যদি থাকে তা হলে সেটি যথার্থ মার্ক্সবাদসম্মত বিশ্লেষণ কি না। তৃতীয়ত, এগুলো দেখার সাথে সাথে দল বিচারের ক্ষেত্রে আরও দেখতে হবে, প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই দলের বিচারধারা (মেথডোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ) কী এবং দলের মূল রণনীতি, প্ল্যান, প্রোগ্রাম এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল কোন শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং চতুর্থত দেখতে হবে, সেই দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণ এবং চলবার রীতিনীতি কোন শ্রেণির সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে। এখানে মনে রাখতে হবে, নেতা ও কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ও জনতার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও যুক্তিহীন আচরণে প্রশ্রয়দান, নানা বুর্জোয়া কুসংস্কারের প্রভাব, অন্ধতা, একগুঁয়েমি, উচ্ছৃঙ্খলতা, হামবড়া ভাব, মিথ্যা বলার অভ্যাস— এগুলো থাকলে বুঝতে হবে, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান।

তা হলে দেখা গেল, দল বিচারের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যেমন পার্টির বিপ্লবী তত্ত্বকে প্রথমে বিচার করতে হবে, তেমনি সাথে সাথে সেই দলের চিন্তা ও বিচারপদ্ধতি এবং দলের নেতা ও কর্মীদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে সংস্কৃতিগত মান যা তাঁরা প্রতিফলিত করছেন, তাকেও বিচার করে দল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান, অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করা ব্যতিরেকে এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রয়োগও সঠিক হতে পারে না। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও-এর মূল বিচারধারা সম্পর্কে যাঁরা জানেন, তাঁরাই আমাদের এ কথা বুঝতে সক্ষম হবেন। **এখানে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ ছাড়া মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে শুধুমাত্র বই পড়া জ্ঞান, অথবা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সংযোজন ছাড়া শুধুমাত্র শোষিত মানুষের আন্দোলনগুলি পরিচালনার মধ্য দিয়ে অর্জিত যে জ্ঞান— এই দুটোই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান মাত্র।** সমস্ত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরাই জানেন, এই দুটোকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত করতে পারলেই কেবলমাত্র মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক তত্ত্বের ধারণা অর্জন করা সম্ভব। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে না পারলে এ দুটো আংশিক জ্ঞানকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে সংযোজন করে চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, অর্থাৎ তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতা অর্জন করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। এই দিকগুলি সম্পর্কে খেয়াল রেখেই দল বিচারের দুরূহ কাজটি আমাদের সম্পন্ন করতে হবে।

এ ছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও দল বিচারের সময় খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে, পার্টিটি কী পদ্ধতিতে, কোন ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং তার নেতৃত্ব সম্বন্ধে ধারণাটি কী? সেটি কি পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির মতই আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক (ফরমাল ডেমোক্রেটিক) নেতৃত্বের ধারণা, নাকি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্র ও কেন্দ্রীকরণের নীতির সংমিশ্রণের মারফত গড়ে ওঠা সেটি একটি যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, বুর্জোয়া বিপ্লব যেহেতু উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং এক অর্থে ব্যক্তির বিকাশ ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু বুর্জোয়া গণতন্ত্র, তা যত আদর্শস্থানীয় (মডেল) গণতান্ত্রিক ফর্মেরই হোক না কেন, সেখানে গণতান্ত্রিক ফর্ম-এর মধ্য দিয়ে আসলে ব্যক্তিনেতৃত্বই কাজ করে থাকে। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিই হল কেন্দ্রবিন্দু এবং এ সম্বন্ধে সচেতন উপলব্ধি না থাকলেও বাস্তবে এক ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রক্রিয়াটি গড়ে ওঠে। ফলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আসলে গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তিনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এই গণতন্ত্রের চরিত্র হয়ে পড়ে 'ফর্মাল'। অন্য দিকে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা এবং শ্রমিক শ্রেণির

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনকে অভিনন্দন

একের পাতার পর

দাবিতে পরিণত হয়। সারা দেশে পিকেটিং ও বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়। আওয়ামি লিগের নিচের তলার একটা বড় অংশও আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নেমে আসে। আন্দোলন ভাঙতে সভ্য সমাজের সব রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে সীমাহীন বর্বরতা চালিয়েছে পুলিশ, আধাসেনা সহ সে দেশের শাসক দল আওয়ামি লিগের ছত্রধারী নৃশংস গুণ্ডাবাহিনী। নবম শ্রেণির স্কুল ছাত্র পর্যন্ত শহিদ হয়েছেন এই আক্রমণে। পিটিয়ে, গুলি চালিয়ে হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, হাসপাতালে আসা ছাত্রদের মৃতদেহ দেখে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে।

আন্দোলনের তীব্রতা দেখে সুপ্রিম কোর্ট কোটা সংস্কার নিয়ে শুনানির তারিখ তড়িঘড়ি এগিয়ে আনে। তারা কোটা ব্যবস্থার কিছু সংস্কারের জন্য রায় দিয়েছে। কিন্তু বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এই রায়কে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এই রায় পক্ষপাত-দুষ্ট। কারণ পরে সরকার একে তার ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ফলে কমপ্লিট শাটডাউন চলবে। তাঁরা দাবি করেছেন, সমস্ত হত্যার দায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে এবং দল থেকেও বহিষ্কার করতে হবে। দোষী পুলিশ অফিসারদের বরখাস্ত করতে হবে, সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস খুলে দিতে হবে। ঢাকা, জাহাঙ্গির নগর, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরদের পদত্যাগ করতে হবে। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলিগ হামলা করেছে সেখানে তাদের নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। ছাত্র ও সাধারণ মানুষের ওপর হামলাকারী পুলিশ ও ছাত্রলিগ-যুবলিগ কর্মীদের গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা করতে হবে। শহিদ ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গ্রেফতার হওয়া শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে হবে। আন্দোলনকারীদের ভবিষ্যতে কোনও হয়রানি করা চলবে না।

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ভারতে দিল্লি সহ সমস্ত রাজ্যে মিছিল করেছে এআইডিএসও এবং অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলি। কলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ১৭ জুলাই এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটি এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। তাদেরই উদ্যোগে ভারতের বেশ কয়েকটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বেশ কিছু বামপন্থী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিবৃতি দেয়। বিজেপি-আরএসএস এই আন্দোলনকে ভারত বিরোধী বলে প্রচার করলেও তার কোনও বাস্তবতা নেই।

আন্দোলনের সময় মহিলারা ছাত্রদের মধ্যে খাবার আর জল বিতরণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে স্কুল শিক্ষকরাও ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অভিভাবকরা এসেছেন সন্তানের হাত ধরে। বলেছেন, আমি চাই এই আন্দোলনে আমার সন্তানও অংশ নিক। এই হল যথার্থ অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যা অর্জন করেছে বাংলাদেশ বহু রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। আর ঠিক এখানেই আঘাত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' বলে অভিহিত করেন। ক্ষোভের আগুনে যেন ঘি পড়ে। সমগ্র জনসমাজ উচ্চস্বরে এর তীব্র নিন্দা করে। 'রাজাকার' বাংলাদেশে একটি ঘৃণিত শব্দ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে বাহিনী পাকিস্তানের সেনার হয়ে গণহত্যা চালিয়েছিল তাদের বলা হত রাজাকার।

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে এতদিন কোটা ছিল মোট ৫৬ শতাংশ। ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের কোটা, নারী ও পিছিয়ে পড়া জেলা কোটা ১০ শতাংশ করে, ৫ শতাংশ উপজাতি কোটা, ১ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা। সুপ্রিম কোর্ট তাকে কমিয়ে কোটা ৭ শতাংশ করতে বলেছে। ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কোটা, ১ শতাংশ উপজাতিদের কোটা, ১ শতাংশ প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের কোটা। ৫৩ বছর আগে ঘটা মুক্তিযুদ্ধকে দেখিয়ে এখনও রেখে দেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের কোটা বাস্তবে শাসক আওয়ামি লিগের সুবিধা বিতরণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মানুষের আবেগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাকে ব্যবহার করে শাসকরা দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করছে। ২০১৮-তে এই কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠলে তার সামনে দাঁড়িয়ে সরকার কোটা বাতিল করার ঘোষণা করে। কিন্তু ২০২১-এ কিছু জন হাইকোর্টে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করলে হাইকোর্ট কোটা স্থগিতের আদেশনামা বাতিল করে দেয়। দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবাদের কারণে সরকার সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি নিয়ে অ্যাপিল করে। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা কোটা ফিরিয়ে আনার দায় হাইকোর্টের কাঁধে চাপিয়ে বন্দুকটি নিজের হাতেই রেখেছিলেন। তিনি কোটা সংস্কারের দাবিকে রাজাকারদের আন্দোলন বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে কথা বললেই এখন রাজাকার বলে দাগিয়ে দেওয়াটা শেখ হাসিনার দল ভালই রপ্ত করেছে। তীব্র ক্ষোভে ছাত্ররা স্লোগান তুলেছেন, 'আমি কে — রাজাকার! তুমি কে— রাজাকার! কে বলেছে— স্বৈরাচার'। তাঁরা স্লোগান দিয়েছেন, 'চাইতে গিয়ে অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার'! এই স্লোগান নিয়ে অনেকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন, যেন বাংলাদেশের ছাত্ররা নিজেদের রাজাকার বলে গর্ব অনুভব করছেন। কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাতেই উঠেছে এই স্লোগান।

এই বছর জানুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামি লিগই তাদের পছন্দমতো কিছু লোককে খাড়া করে বিরোধী হিসাবে দাঁড় করিয়ে ভোটে জিতেছে। ২০১৪ এবং ২০১৮-তেও প্রায় একই কায়দায় আওয়ামি লিগ নির্বাচনের প্রহসন করে ক্ষমতা দখল করেছিল। বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের যখন তখন গ্রেপ্তার করা, এমনকি পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু খুব সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হচ্ছে। ১৯৯০ থেকে বাংলাদেশে যে দলের সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারা জনগণের ওপর নিপীড়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। বিএনপি, জামাত কিংবা আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় যারাই আসুক না কেন ঘটনাটা একই। ২০০৮ থেকে এই সময় পর্যন্ত চলা আওয়ামি লিগের শাসনে এই আক্রমণ আরও তীব্র, আরও নগ্ন হয়েছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। নানা ধরনের অগণতান্ত্রিক কালা আইন জারি করেছে আওয়ামি লিগ সরকার। সরকার বিরোধী মতপ্রকাশের ওপর ক্রমাগত নানা নিষেধাজ্ঞা চেপেছে। বাংলাদেশে কায়েম হয়েছে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শাসন।

বাংলাদেশের ছাত্রদের কোটা বিরোধী আন্দোলনের পিছনে আসলে কাজ করেছে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত তীব্র ক্ষোভ। মূল্যবৃদ্ধি প্রতি মাসেই তার আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে। বেকারত্ব আকাশ ছুঁয়েছে। সরকারি হিসাবে বেকারের সংখ্যা ২৪.৩০ লক্ষ দেখালেও বিবিসির সংবাদদাতার মতে এ বছর ১ কোটি ৮০ লক্ষ যুবক-যুবতী কাজের সন্ধানে ঘুরছেন (দ্য ডেলি স্টার ৩০.১০.২৩। বিবিসি নিউজ ২২.০৭.২৪)। পোশাক কারখানা বা গারমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে অতি সামান্য মজুরিতে কিছু কাজ ছাড়া কাজের সুযোগ অতি সীমিত। স্নাতক বা উচ্চশিক্ষিতদের কাজের সুযোগ আরও কম। সে দেশের কিশোর থেকে যুবরা দলে দলে পাড়ি দেয় বিদেশে কিছু কাজের আশায়। বহু পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে সেই ভরসাতেই। আর্থিক বৈষম্য বেড়েছে মারাত্মক হারে। বেশিরভাগ মানুষ চরম দারিদ্রের শিকার, অথচ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে বিপুল সম্পদ জমা হয়েছে। তাদের পৃষ্ঠপোষক হল পুঁজিবাদী সরকার। এই পরিস্থিতিতে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসলে বেকারত্বের জ্বালা থেকেই উঠে আসে। মানুষের অভিজ্ঞতা বলে, কোটা বা সংরক্ষণ থাকুক আর নাই থাকুক, দেশের অধিকাংশ মানুষেরই উচ্চশিক্ষা কিংবা চাকরি পাওয়ার আশা নেই। যে সত্যটা ভারতের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) বারবার তুলে ধরেছে। সমস্ত কর্মক্ষম মানুষের কাজ চাই এই দাবিটাকে শাসক শ্রেণি বারবার গুলিয়ে দিতে চায়।

বাংলাদেশের এই আন্দোলন একটা সত্যকে দেখিয়ে দিয়ে গেল, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জেদ নিয়ে মানুষ যখন দাঁড়ায় কোনও বন্দুক, অস্ত্র, কামান তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বুর্জোয়া শাসকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছিল, আর প্রতিবাদের ভয় নেই। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে দেখা যাচ্ছে দেশে দেশে প্রতিবাদী জনগণ মাথা তুলছেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্যালেস্টাইনের সমর্থনে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের মার খাচ্ছেন। ইউরোপেও বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে বারবার। ভারতে ২০১২-তে নির্ভয়া কাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবরা ডিসেম্বরের প্রবল ঠাণ্ডাতেও পুলিশের জলকামানের সামনে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ২০২০-২১ জুড়ে হাজার হাজার কৃষক দিল্লির সীমান্তে অবরোধ করে অসীম দৃঢ়তায় লড়াই জারি রেখেছেন। ৭০০ শহিদের জীবনের বিনিময়ে তাঁরা সরকারকে মাথা নত করিয়েছেন। শোষণ অত্যাচারই শেষ কথা নয়। শোষণের অবসানের জন্য মানুষ লড়বেই। তারা পথ খুঁজবেই। একটা আন্দোলন মার খেতে পারে, কিন্তু শহিদের রক্তধারা যে পথ দেখিয়ে যায় তা ব্যর্থ হয় না। এই ধারাই মনুষকে শেষ পর্যন্ত সত্য পথ চেনায়। এই লড়াইয়ের পথ ধরেই একদিন শক্তি অর্জন করবে বিপ্লবী শক্তি, বিপ্লবী দল।

বাংলাদেশের আন্দোলন স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে—'সমাজে শ্রমিক-চাষি-শোষিত মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিপ্লব বারবার গমকে গমকে আসতে চাইবে, গমকে গমকে ফেটে পড়তে চাইবে, সমাজ অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব ফুলে উঠে বারবার বলতে চাইবে— এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই, মানুষের মগজের কাছে, মানুষের কাছে আবেদন করতে চাইবে— বিপ্লব আমি চাই। কিন্তু, বিপ্লব ততদিন হবে না, বারবার সে ফিরে যাবে, বিপথগামী হয়ে ফিরে যাবে, বারবার তার দ্বারা প্রতিক্রিয়া লভবান হবে— বিপ্লব হবে না, যতদিন না বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী পার্টির আবির্ভাব হবে।' বীর ছাত্রদের রক্তস্রোত তাদের সঠিক রাস্তায় পৌঁছতে সাহায্য করবে— এই আশা নিয়ে ভারতের মেহনতি মানুষের পক্ষ থেকে আবার তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

এসইউসিআই(সি)-র কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট
https://sucic.org

প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

একের পাতার পর

হতে বাধ্য হচ্ছেন, কেউ কেউ ভিন রাজ্যে ভর্তি হয়ে যাচ্ছেন। সংগঠনের অভিযোগ, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সিট পূরণ না হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে জাতীয় এবং রাজ্য শিক্ষানীতির প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করা ও সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। সংগঠনের দাবি, সকল আবেদনকারী ছাত্রছাত্রী যাতে তাদের পছন্দের বিষয় এবং কলেজে ভর্তির সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে।

বিশ্বজিৎ রায় বলেন, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এখনও ভর্তিতে আবেদন করতে চায় তাদের আবেদন করার সুযোগ এবং ভর্তির ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে। এক লক্ষ দশ হাজার ছাত্রছাত্রী আবেদন করেও ভর্তির সুযোগ পায়নি, অথচ বহু আসন ফাঁকা আছে। এই ছাত্রদেরও ভর্তির ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে। সংগঠনের আশঙ্কা, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর যখন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষের দিকে যাবে তখন বহু কলেজে অনেক আসন ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন এবং তাদের পেটোয়া ছাত্র সংগঠন পছন্দের বিষয় এবং কলেজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ছাত্রছাত্রীদের আসন বিক্রি করবে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। সংগঠন দাবি করেছে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে যাতে ভর্তি প্রক্রিয়া চলে তা রাজ্য সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। সংগঠন দাবি জানায়, দ্রুততার সাথে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে প্রথম সেমেস্টারের পঠন-পাঠন শুরু করতে হবে। আগামী বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাধিকার রক্ষা করে পরিকল্পনাহীন কেন্দ্রীয় পোর্টালে ভর্তি বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক পোর্টালের মধ্য দিয়ে দুর্নীতিমুক্ত ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

মানিকচকে গুলি চালনায় দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দাবি অ্যাবেকার

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকার) সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ১৮ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন,

মালদহের মানিকচকে গত ছয় মাস ধরে রাতে দীর্ঘ সময় লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা অত্যন্ত সঙ্গত কারণে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি উপযুক্ত পরিষেবা না দিয়ে বছর বছর বিদ্যুতের বিল বাড়াচ্ছে। রাজ্য সরকারের উচিত ছিল রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কাছে এই দীর্ঘ লোডশেডিং-এর কারণ তলব করা। কিন্তু তার বদলে প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাল। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। দাবি করছি, ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে দোষী পুলিশ অফিসারদের অবিলম্বে শাস্তি, গুলিতে আহত গ্রামবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, গ্রেফতার হওয়া নির্দোষ প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের অবিলম্বে মুক্তি এবং এলাকায় অবিলম্বে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

সিপিডিআরএসের প্রতিবাদ ঃ মানিকচকে পুলিশের গুলি চালানোর তীব্র নিন্দা করেছে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস।

১৯ জুলাই এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রয়োজন ছিল শুরু থেকেই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। তা না করে পুলিশের একরোখা আগ্রাসী মনোভাবের জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী পুলিশদের শাস্তি, গ্রেপ্তার হওয়া প্রতিবাদীদের অবিলম্বে মুক্তি, আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ রাজ্য জুড়ে সর্বত্র বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

বিদ্যুতের মিনিমাম ও ফিক্সড চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ প্রিপেড স্মার্ট মিটার লাগানোর চক্রান্ত রুখতে গ্রাহক প্রতিরোধ আন্দোলন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অ্যাবেকার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির আহ্বানে ১৮ জুলাই তমলুকের ব্রহ্মা বারোয়ারি হলে প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র দাস মঞ্চে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সপ্তদশ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক প্রদীপ দাস ও অন্য নেতৃবৃন্দ। সভায় মূল বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নীরেন কর্মকার ও অশোকতরু প্রধান।

জয়মোহন পালকে সভাপতি, শংকর মালাকারকে সম্পাদক, নারায়ণ চন্দ্র নায়ককে অফিস সম্পাদক করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বিষ্ণুপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ

প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে এবং লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ সমস্যার দ্রুত সমাধান, বর্ধিত ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ বাতিলের দাবিতে ও প্রতিবাদী নিরপরাধ গ্রাহকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে অ্যাবেকার ডাকে ১৬ জুলাই বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেওয়া হয় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে।

রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ। রাজ্য সভাপতি অনুকূল ভদ্রের নেতৃত্বে জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, সভাপতি অমিয় গোস্বামী সহ দশ জনের প্রতিনিধি দল ম্যানেজারের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন।

মোবাইল মাশুল বৃদ্ধি ঃ গাজোলে বিক্ষোভ

মোবাইলের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১০ জুলাই মালদা জেলার গাজোলে বিদ্রোহী মোড়ে বিক্ষোভ দেখায় এআইডিওয়াইও। মাশুল বৃদ্ধির প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের মালদা জেলার পক্ষে কমরেড সুভাষ সরকার বলেন, এমনিতেই জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ভয়ঙ্কর, তার পর ২৫-৩০ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধিতে মানুষ দিশেহারা। বিক্ষোভ সভায় ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক মাইতি। তিনি সর্বস্তরের মানুষকে মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ফসলের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দামের দাবি

১৫ জুলাই দেশ জুড়ে কৃষক বিক্ষোভ

উৎপাদনের খরচের দেড়গুণ দামে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সরকারকে ফসল কেনার দাবি তুলল এ আই কে কে এম এস। ১৫ জুলাই দেশের ১৮টি রাজ্যে জেলা, মহকুমা, ব্লক ও গ্রাম স্তরে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, অবরোধ প্রচারসভা ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার হাজার কৃষকের অংশগ্রহণে পালিত হল দাবি দিবস।

নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৭১টি ব্লকে এই দাবিগুলি সহ ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ব্লক অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। কোচবিহারে খেতে কাজ করার সময় কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ রেখে কৃষক ও খেতমজুররা বিক্ষোভ সভায় যোগ দেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বাদাম চাষিরা বাদাম পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং বসিরহাটে পাট চাষিরা পাট পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। এ দিন কাটোয়া স্টেশন থেকে সুসজ্জিত মিছিল মহকুমা শাসক দপ্তরে যায় এবং দাবিপত্র পেশ করে। চাষিরা দাবি তোলেন, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে অবিলম্বে সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। তাদের আরও দাবি চাষির কাছ থেকে সরাসরি ফসল কিনে সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিক্রি করতে হবে যাতে চাষি ও আমজনতা উভয়ই ফড়ে ও অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

তাদের আরও দাবি, এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করতে হবে, সমস্ত কৃষি মজুরদের সারা বছরের কাজ ও উপযুক্ত মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে, সংশোধিত বিদ্যুৎ বিল ২০২৩ বাতিল করতে হবে এবং কোনও মতেই স্মার্ট মিটার চালু করা চলবে না, কৃষিঋণ মকুব করতে হবে এবং ষাটোর্ধ্ব কৃষক ও খেতমজুরদের উপযুক্ত পরিমাণে পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে, সস্তা দরে চাষিদের সার বীজ তেল সহ চাষের উপকরণ সরবরাহ করতে হবে এবং চাষের কাজে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিতে হবে, খরা-বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধে উপযুক্ত 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরি করে তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষির (ভাগ ও লিজ চাষি সহ) ফসলের ক্ষতিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য কার্যকরী ফসল বিমা চালু করতে হবে।

এই দাবিগুলি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। দাবি সংবলিত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর শুরু হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে কৃষক খেতমজুরদের মহা পঞ্চায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে এবং ওই দিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি সম্বলিত স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে।

নেতৃবৃন্দ ক্ষোভের সাথে বলেন, পাটের প্রকৃত এমএসপি হওয়া উচিত কুইন্টাল প্রতি ১৩ হাজার টাকা, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার পাটের এমএসপি নির্ধারণ করেছে কুইন্টাল প্রতি মাত্র ৬০০০ টাকা। এখন পাট ওঠার মুখে এই দামেও চাষিরা পাট বিক্রি করতে পারছেন না। জেসিআই পাট কিনতে নামছে না। কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেট স্বার্থে ফুড প্যাকেজের জন্য (বিশেষ করে চিনির ক্ষেত্রে) পরিবেশ দূষণকারী সিনথেটিকের ব্যবহার অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে পশ্চিমবাংলায় ৪০ লক্ষ পাট চাষি পরিবার বিপন্ন। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ভূমিকাও ন্যক্কারজনক। তারা এক কেজি পাটও কেনে না। বাস্তবে তারা পাটকল মালিক ও ফড়েদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এরই পথ বেয়ে কৃষকদের উপর নেমে আসছে কর্পোরেটের আক্রমণের থাবা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মালিক তোষণকারী নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন কৃষকরা। সংযুক্ত কিসান মোর্চা আগামী ৯ আগস্ট 'কর্পোরেট হটাও' দিবসের ডাক দিয়েছে। কৃষকরা দেশব্যাপী আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এ আই কে কে এম এস এর ডাকে কৃষক-খেতমজুরদের ঐতিহাসিক মহাপঞ্চায়েতকে সর্বাত্মক সফল করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

পাঠকের মতামত

কলেজ শিক্ষায় সর্বনাশ

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দ্বারা প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি কলেজ স্তরে চালু করল রাজ্য সরকার। দেশের ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী মহলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ২০২০ সালের ২৯ জুলাই এই শিক্ষানীতি বিজেপি সরকার দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। দাবি করা হয় এই নীতি শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। কিন্তু কার্যত শিক্ষার প্রাণসত্তাকেই ধ্বংস করবে এই শিক্ষানীতি। বিজ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কোনও স্থানই নেই এই শিক্ষানীতিতে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আশা করেছিল, এ রকম সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরোধিতাই করবে তৃণমূল সরকার। কিন্তু তা না করে 'রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩'-এর নামে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির সামান্য কিছু পরিবর্তন করে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণাই করে দিলেন 'কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফেমওয়ার্ক'। এ বারে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর থাকবে।

শিক্ষার্থীরা এক বছর বা দু'বছর পর পাবে এক একটা সার্টিফিকেট। আবার চার বছর বাদে পাবে রিসার্চ উইথ অনার্স ডিগ্রি সার্টিফিকেট। কলেজগুলো শুধু ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট কেনাবেচার একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। জ্ঞান যে একটা সামাজিক সম্পদ— এই বোধ গড়ে তোলাই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই বোধ একেবারেই গড়ে উঠবে না। সার্টিফিকেট নিয়ে কিছু একটা করে জীবন নির্বাহ করার চিন্তাভাবনাই শিক্ষার্থীদের মনে কাজ করবে, যা তাকে সমাজ বিমুখ করবে।

দ্বিতীয়ত, ড্রপ-আউটের সংখ্যা বাড়বে। এই চার বছরের ডিগ্রি কোর্সে বলা হয়েছে, একজন শিক্ষার্থী এক বছর বা দু'বছর পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট নিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে পারবে। আমাদের মতো দেশে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে পড়াশোনা করতে পারে না। অনেককে স্কলারশিপের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেককে স্কলারশিপ আবার দেওয়াও হয় না। এই অবস্থায় এক বছর বাড়তি খরচ চালাতে হলে বহু ছাত্রছাত্রী পড়ার কথা ভাবতেই পারবে না। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের উচিত ছিল শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করে শিক্ষার সমস্ত দায়ভার সরকারেরই নেওয়া। কিন্তু তার বদলে বেসরকারি হাতে শিক্ষা তুলে দিয়ে ছাত্রদের উপর ব্যয়ভার বাড়ানো হয়েছে।

তৃতীয়ত, রয়েছে সেমেস্টার প্রথা যেখানে একটি বছরকে ছ মাস করে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই প্রথার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক গভীর জ্ঞান অর্জন কখনওই সম্ভব নয়। নানা ছুটিছাটার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদিবস নষ্ট হওয়ার ফলে সময়ের অভাবে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা সিলেবাস দ্রুত শেষ করতে গিয়ে অনেক বিষয় হয়ত পড়াতেই পারবেন না। ফলে বিষয়ভিত্তিক গভীর জ্ঞান গড়ে উঠবে না।

চতুর্থত, কলেজ স্তরে থাকবে 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স'। এই পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষাতে বিজ্ঞানসম্মত বিষয় বিভাজন থাকবে না। আমরা জানি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস জানতেই হয়। আবার পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করলে গণিত ও রসায়ন ভালো করে পড়তেই হয়। কিন্তু এখন এতে আর বাধ্যবাধকতা থাকছে না। শিক্ষার্থীর বেশি নম্বর পাওয়ার মানসিকতা থাকার ফলে ইচ্ছামতো যে কোনও বিষয় নির্বাচন করে পড়াশোনা করতে পারবে। বিশেষ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ বা স্পেশালিস্ট বলে আমরা এতদিন যে, জেনে এসেছি এতে তা আর থাকছে না।

পঞ্চমত, কলেজের পরিকাঠামো অনুযায়ী বহু কলেজে অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি সহ বহু পরিকাঠামোই নেই। যেখানে তিন বছরের কোর্স শেষ করাই কঠিন, সেখানে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ নষ্টই করবে।

দেশে যাঁরা শিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী তাঁদের দাবি মেনে যদি এই শিক্ষানীতি বাতিল না হয় তাহলে দেশের ছাত্রসমাজ ভবিষ্যতে ডিগ্রিধারী যুক্তিহীন যন্ত্রমানবে পরিণত হবে।

বুদ্ধদেব রায়
ক্ষুদিরাম সরণি, কোচবিহার

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

তিনের পাতার পর

নেতৃত্বে উৎপাদনের ওপর যৌথকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু শ্রমিক শ্রেণির গণতন্ত্রে নেতৃত্বের ধারণা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা।

যৌথ নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়

এই যৌথ নেতৃত্বের ধারণা বলতে কী বোঝায়? লেনিন বলেছেন, দলের সকল সদস্যের যৌথ জ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। অর্থাৎ শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েই নয়, জীবনের প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে পার্টির সমস্ত সভ্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেই যৌথজ্ঞানের বিশেষীকৃত রূপে (কংক্রিট ফর্ম) প্রকাশ হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ওপর আলোচনায় আমি এটাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলেছি, এ যুগে কোনও একটি দল আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটিয়ে একমাত্র তখনই এই যৌথ-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, যখন পার্টির সমস্ত নেতা ও কর্মীর চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেটার ব্যক্তিকরণ ও বিশেষীকৃত প্রকাশ ঘটেছে, অর্থাৎ একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথ নেতৃত্বের সর্বোত্তম রূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। কারণ, দলের নেতা ও কর্মীদের চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান দলের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে সেই নেতৃত্ব, অর্থাৎ 'অথরিটি'র ধারণা, কোনও মতেই বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্ট) হতে পারে না। আর, এইজন্যই যৌথ-নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে এ কথার বাস্তব প্রমাণ হল যে, সে ক্ষেত্রে কোনও না কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে ব্যক্তিকরণ (পার্সনিফিকেশন) ঘটেছে।

বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করে বললে আপনাদের পক্ষে বোঝা সুবিধা হবে। ধরুন, আপনি-আমি যে চিন্তা করি, যাকে আমরা ব্যক্তিচিন্তা বলি, সেটা কী? একজন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সামাজিক চিন্তার যে ভাবে ব্যক্তিকরণ ঘটে, তাকেই আমরা ব্যক্তিচিন্তা বলি। ঠিক তেমনিই পার্টির নেতা, কর্মী, সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের ও শ্রমিক শ্রেণি এবং জনসাধারণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্ম নিচ্ছে, সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকের মধ্যেই সেই চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ব্যক্তিকরণ ঘটছে। কিন্তু, যে হেতু আমরা জানি, এই বস্তুজগতে কোনও দুটো বিষয় (ফেনোমেনা) একেবারে হুবহু এক হতে পারে না, সেই একই কারণে পার্টির সমস্ত সভ্য ও নেতাদের সম্মিলিত সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপলব্ধি সকলের মধ্যে এক হতে পারে না। যার মধ্য দিয়ে এই যৌথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটে, তিনিই যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ হিসাবে দেখা দেন। রাশিয়ান বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লেনিন এবং চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাও সে-তুঙ-এর অভ্যুত্থান সেই সমস্ত পার্টিগুলিতে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যৌথজ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে মানে, দলের সমস্ত নেতা ও কর্মী, র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল, শ্রমিক শ্রেণি ও জনসাধারণের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, দলের সর্বোচ্চ কমিটির কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। দলের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে যখন এইভাবে সর্বোত্তম রূপে ব্যক্তিকরণ হয়, নেতৃত্বের বিকাশের একমাত্র সেই স্তরেই দলের অভ্যন্তরে 'গ্রুপইজম' এবং নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণ রূপে খতম করা সম্ভব এবং দলের অভ্যন্তরে এই অবস্থার উদ্ভব হলেই একমাত্র বলা চলে যে, দলটি প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করতে এবং যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মনে রাখতে হবে, দলটির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতির দোহাই পেড়ে ও যৌথ নেতৃত্বের নামে আসলে আনুষ্ঠানিকগণতান্ত্রিক নেতৃত্বই কাজ করে চলেছে।

এই যৌথজ্ঞান বলতে শুধুমাত্র অর্থনীতিগত বা রাজনীতিগত ধ্যানধারণাগুলিকেই বোঝায় না, জীবনের সর্বস্তরে— অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত ব্যক্তিগত ধারণা ও আচরণের সমস্ত স্তরে— একটি সংযোজিত, সুসংবদ্ধ এবং সামগ্রিক (কোঅর্ডিনেটেড অ্যান্ড কম্প্রিহেনসিভ) ধারণাকে বুঝিয়ে থাকে। পার্টি কর্মী ও নেতাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, সেটাই পথনির্দেশ হিসাবে প্রতিটি কর্মী ও নেতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ধ্যানধারণা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার, এই যৌথজ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বাস্তবে সামাজিক জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নেতা ও কর্মীর অভিজ্ঞতার সাথে যৌথজ্ঞানের যে প্রতিনিয়ত সংঘাত ঘটে, তার দ্বারা আবার এই যৌথজ্ঞান সমৃদ্ধ হয় এবং নেতা ও কর্মীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও রুচির মানও ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে।

মনে রাখতে হবে, পার্টির অভ্যন্তরে নেতা ও কর্মীদের পরস্পর সম্বন্ধ দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির এই সম্পর্কের দ্বারা পরিচালিত না হলেই সে সম্পর্কের চরিত্র হয়ে পড়ে যান্ত্রিক। এবং এই অবস্থা পার্টির মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে, পার্টির অভ্যন্তরে ব্যক্তিবাদকে খতম করা দূরের কথা, বরং ব্যক্তিবাদ পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে কাজ করে চলেছে এবং এই অবস্থায় পার্টিটি নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া পার্টির মতোই আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার সংমিশ্রণে কার্যত যান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক উপায়ে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবীরূপে পার্টির উচ্চস্তরে ব্যুরোক্রেটিক নেতৃত্বের জন্ম হয়ে থাকে। ফলে, এই অবস্থায় পার্টি নেতাদের মধ্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তে শুধু যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে ওঠে তাই নয়, পার্টি নেতারা নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিবাদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হন এবং পার্টিটি কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার একদিকে থাকে আমলাতান্ত্রিক এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত একদল নেতা ও তাত্ত্বিক, অন্য দিকে কর্মীদের মধ্যে অন্ধতা ও অন্ধ আনুগত্যের ফলে থাকে অন্ধভাবে অনুসরণকারী সৎ, ডেডিকেটেড, নিষ্ঠাবান অথচ উগ্র কর্মীর দল।

ফলে বুঝতে পারছেন, এই অবস্থায় পার্টির অভ্যন্তরে তত্ত্ব এবং কর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে না। ফলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে মনগড়া এবং বাস্তববিবর্জিত (অ্যাবস্ট্রাক্ট), আর কার্যকলাপ হয়ে পড়ে অন্ধ ও উগ্র ধরনের। এখন, সিপিআই, সিপিআই(এম) এবং নকশালপন্থী গ্রুপগুলির কার্যকলাপ, সংগঠনপদ্ধতি, কর্মীদের চেতনার মান প্রভৃতির দিকে লক্ষ করলেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, ঠিক এই অবস্থাই এদের সকলের মধ্যে বর্তমান।

'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল' বই থেকে

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালু ও বিদ্যুতের দাম পাঁচ-ছয় গুণ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৩ জুলাই মধ্যপ্রদেশের গুনায় বিক্ষোভ

সরকার স্বার্থ দেখছে কর্পোরেটের

আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা

কৃষকের চাষের খরচ অত্যধিক হারে বেড়েছে, বাড়ছে ঋণগ্রস্ত চাষির সংখ্যা। একই সঙ্গে বাড়ছে ঋণগ্রস্ত চাষির আত্মহত্যার সংখ্যাও। ২০১৫ থেকে ২০২২-এর মধ্যেই শুধু ১ লক্ষ ৪৭৪ জন কৃষক ও কৃষিশ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন (ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো)। গত ১০ মাসে শুধু মহারাষ্ট্রেই ২ হাজার ৩৬৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছেন। খেতে-খামারে গলায় ফাঁস দিয়ে বা কীটনাশক খেয়ে প্রায়শই কৃষকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেন?

কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। ধান সহ ১৪টি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সম্প্রতি নামমাত্র বাড়িয়ে তাদের কৃষক-দরদ প্রমাণ করতে ঢাকঢোল পেটাচ্ছে বিজেপি সরকার। ধানে প্রতি কুইন্টালে বাড়িয়েছে ১১৭ টাকা। অর্থাৎ কেজি প্রতি বৃদ্ধি মাত্র ১.১৭ টাকা। এটা চাষির সাথে ঠাট্টা নয়!

প্রতি কুইন্টাল ধানে অন্তত ৩১০০ টাকা না পেলে চাষির ন্যূনতম লাভ থাকে না। সেখানে সরকার মাত্র ২৩০০ টাকা সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছে। এতে যে চাষিদের ক্ষতির মুখেই পড়তে হবে, তা কি সরকারের যে মন্ত্রী-আমলারা এই মূল্য স্থির করছেন, তাঁদের অজানা? যদি সত্যিই অজানা হয় তবে তো তাঁরা এই কাজের যোগ্যই নন। আর যদি জেনেই এ কাজ করেন, তবে এই সরকারকে কৃষক স্বার্থবিরোধী বলা হবে না কেন?

২০২০-২১-এ দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল— স্বামীনাথন কমিটি নির্ধারিত হারে এমএসপি দিতে হবে। ফসলের ন্যায্য দাম চাষির হাতে পৌঁছনোর জন্য সরকারের ফসল কেনার সুব্যবস্থা, চাষির লোকসান হলে সরকারি সহায়তা বা ঋণ মকুব, সস্তায় বীজ-সার-কীটনাশকের বন্দোবস্ত ইত্যাদি। এগুলি কি একটা নির্বাচিত সরকারের কাছে দেশের কৃষকদের খুব অন্যায় দাবি? অথচ সেই দাবিগুলি মেনে নিতে সরকার নারাজ। এক কথায় দেশের কৃষকরা যাতে ঠিকমতো সংসার প্রতিপালন করতে পারে এবং আগামীতে খাদ্য উৎপাদন বজায় রেখে দেশবাসীর জন্য খাদ্যের সরবরাহ ঠিক রাখতে পারে, সে জন্য অপরিহার্য ন্যূনতম অধিকার তারা দাবি করেছিল। তার সাথে তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল— কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। কর্পোরেটদের হাতে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজেপি সরকার যে আইন আনতে চেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে দেশের কৃষকরা দিল্লির রাস্তায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা অগ্রাহ্য করে, পুলিশি দমন-পীড়ন সহ্য করে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন ৭০০-র বেশি কৃষক। আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়েছিল কৃষক-বিরোধী তিনটি কালা আইন প্রত্যাহার করতে। কিন্তু এমএসপি-র প্রতিশ্রুতি সরকার রক্ষা করেনি। ফলে কৃষক সমাজের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। বাড়ছে বিক্ষোভ এবং তা আন্দোলনের আকারে মাঝেমধ্যেই ফেটে পড়ছে। অথচ সরকার চাইলেই সার-বীজ-কীটনাশকের দাম নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে দিয়ে বা ভর্তুকি দিয়ে ফসলের উৎপাদন খরচ কমাতে পারত। তা না করে বহুজাতিক সংস্থার অবাধ লুঠের জন্য এগুলি তাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। মনসান্টো সহ ২০টি বহুজাতিক কোম্পানি সার, বীজ, কীটনাশক উৎপাদন ও বিক্রির বাজারটি নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা কৃষকের পকেট কেটে নিজেদের লাভের ভাণ্ডার আরও ভরিয়ে তুলছে। সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

যেহেতু ফসল বিক্রির সরকারি ব্যবস্থাপনা

২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে

কৃষক ও খেতমজদুর মহাপঞ্চায়েত

নেই, তাই কৃষককে যেতে হয় ফড়ে-আড়তদার এবং ব্যবসায়ীদের কাছে। এই সুযোগে অত্যন্ত কম দামে চাষির কাছ থেকে ফসল কিনে নেয় মুনাফাবাজরা। সেই ফসলের একটা অংশ বাজারে বিক্রি করে চড়া দামে। বাকি অংশ মজুত করে রেখে দেয়, চাহিদা বাড়লে আরও বেশি মুনাফায় বিক্রি করার জন্য। এই মধ্যস্বত্বভোগী আর বহুজাতিক কোম্পানিগুলির শোষণের শিকার একদিকে চাষিরা, অন্য দিকে খাদ্যদ্রব্যের ক্রেতা বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ।

সরকারি ঋণ-ব্যবস্থাও অত্যন্ত জটিল। চাষিরা সহজে সেই ঋণ পান না। ফলে কৃষকরা গ্রামীণ মহাজন-সুদখোরদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হন। সেই ঋণ শুধতে বহু সময়েই কৃষককে সর্বস্বান্ত হতে হয়। যতটুকু ব্যাঙ্কঋণ চাষিরা পান, চাষে ক্ষতি হলে সেই ঋণ মকুবের বিষয়ে উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করে না সরকার। কিন্তু কর্পোরেট কোম্পানিগুলির ঋণ মকুব হয়ে যায় অনায়াসে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের চাষিদের মধ্যে এই প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এই সরকার— কৃষকদের না কর্পোরেট-মালিকদের?

এখনও কৃষি মূলত প্রকৃতি-নির্ভর। তাপপ্রবাহ, খরা, বন্যা, অসময়ে বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির কারণে কৃষকের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফসল বিমা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বাঁচার একটা অবলম্বন। এর জন্য সরকার ঘোষিত 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' রয়েছে। কিন্তু তার এমন সব জটিল শর্ত রয়েছে, যাতে ক্ষুদ্র ও মধ্য চাষির কাছে এর সুযোগ প্রায় পৌঁছয় না। কিন্তু বিমার সুযোগ কর্পোরেট কোম্পানিগুলি অনায়াসেই হস্তগত করে।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো সেচ ও বিদ্যুৎ বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে সরকার। ফলে চাষের জন্য কৃষককে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে। সরকারের হাতে থাকলে স্বল্পমূল্যে কিংবা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারত কৃষক। এখন বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি স্মার্ট মিটার নিয়ে আসায় বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের বোঝা গৃহস্থের সাথে চাপছে কৃষকের ঘাড়েও। সরকারের কৃষি-নীতি কৃষিকে অলাভজনক করে তুলছে।

এ ছাড়াও সরকারি অবহেলার শিকার হচ্ছেন গ্রামীণ বেকার যুবকরা। ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি-শ্রমিক হিসাবে কিছু কাজ করানো হয় কৃষিক্ষেত্রে। কিন্তু তাদের কর্মদিবস দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪২-এ। মজুরি বৃদ্ধির দাবিও মানা হয়নি। গ্রামীণ বেকার যুবকদের কোনও রকমে দিন যাপনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের কিছুটা হলেও যে ভূমিকা ছিল এবং যাতে কৃষকদেরও অনেকখানি সুবিধা হত, বরাদ্দ কমিয়ে তাকে আরও খোঁড়া করে দিয়েছে সরকার।

এক সময়ে বামপন্থী আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'কৃষককে জমি দাও'। আজ দেশের পুঁজিবাদী সরকারগুলির স্লোগান 'কর্পোরেটকে জমি দাও'। বনবাসী-উপজাতি-জনজাতি এলাকাগুলিতে কোনও ক্ষতিপূরণ না দিয়েই, কোথাও নামমাত্র দিয়ে খনি ও অন্যান্য কাজের অজুহাতে বহুজাতিক কোম্পানি জমি লুট করছে সরকারি সহায়তায়।

সরকারের সহায়তায় কর্পোরেটের কৃষিক্ষেত্রকে লুটের মোকাবিলা করতে হলে দিল্লির কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে কৃষক ও খেতমজুরদের সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। খেত-খামার থেকে শহর সর্বত্র আওয়াজ তুলতে হবে— কৃষক স্বার্থে সরকারি কৃষি-নীতি তৈরি করো, কর্পোরেটদের স্বার্থে নয়।

ইতিমধ্যেই সংগ্রামী কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এআইকেকেএমএস সহ অন্যান্য কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'র নেতৃত্বে দিল্লিতে কৃষকদের আন্দোলন চলেছে লাগাতার। সেই আন্দোলনকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সংযুক্ত কিসান মোর্চা ৯ আগস্ট 'কর্পোরেট হটাও' দিবসের ডাক দিয়েছে। এআইকেকেএমএস ন্যায্য এমএসপি, ফড়েদের হাত থেকে চাষি ও জনসাধারণকে বাঁচাতে চাষির কাছ থেকে সরাসরি ফসল কিনে সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনগণের মধ্যে বিক্রি, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, কৃষক ও খেতমজুরদের পেনশনের দাবি সহ অন্যান্য দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে কৃষক ও খেতমজুরদের মহাপঞ্চায়েতের ডাক দিয়েছে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার ফুটিগোদা-২ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড খগেন কয়াল বার্ধক্যজনিত কারণে ৪ জুলাই ভোরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

গত শতকের ৫০-এর দশকে বিশিষ্ট নেতা কমরেড ইয়াকুব পৈলানের মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন তিনি। সে দিন এস ইউ সি আই (সি)-র তেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকা সত্ত্বেও আদর্শের টানে তিনি দলে যুক্ত হওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলা ও লোকালের এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

তিনি সর্বদাই অভিভাবকের মতো পরামর্শ ও সাহায্য নিয়ে অসহায় নিঃস্ব মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। তাঁর সরলতা, মধুর ব্যবহার, অকৃত্রিম দরদি ও বিদ্বেষহীন মনোভাবের জন্য এলাকার শিশু-কিশোর থেকে সব বয়সের নারী-পুরুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত আপনজন। কোনও দ্বিধা না রেখে সাধারণ মানুষ যে কোনও বিপদ-আপদে তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। গরিব পরিবারের এই অত্যন্ত সৎ কমরেড ২০ বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, এমনকি একবার কেয়ারটেকার প্রধান হয়েছিলেন। অন্য দল বিপুল টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েত গঠনে সাহায্য চাইলেও ঘৃণাভরে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। লেখাপড়া বিশেষ না জানলেও পার্টির রাজনীতির রুচি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধের মূল সুর যতটুকু আয়ত্ত করেছিলেন, তাতে মানুষকে খুবই আকৃষ্ট করতে পারতেন। দলের প্রতি মান্যতায় তাঁর কোনও ঘাটতি ছিল না। বার্ধক্যে শরীর ভেঙে পড়ার আগে পর্যন্ত দলের কাজ রূপায়ণে ও গণআন্দোলনকে বলিষ্ঠ রূপ দিতে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। গত লোকসভা নির্বাচনেও অসুস্থ শরীর নিয়ে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে গিয়েছেন। এলাকায় দলের প্রতিষ্ঠায় যাঁরা ছিলেন অগ্রগণ্য, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৭ জুলাই তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অংশুমান রায়, লোকাল সম্পাদক কমরেড শক্তি হালদার। সভাপতিত্ব করেন তাঁর প্রবীণ সহযোদ্ধা কমরেড যামিনী দাস। সভা সঞ্চালনা করেন কমরেড প্রসাদ নস্কর। প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য কমরেড অমূল্য মণ্ডল ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কুমকুম সরকার উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন মূল্যবান কমরেডকে হারাল।

কমরেড খগেন কয়াল লাল সেলাম

ঝাড়গ্রাম জেলা শ্রমিক সম্মেলন

১৪ জুলাই এআইইউটিইউসি ঝাড়গ্রাম জেলার প্রথম সম্মেলন হল শহরের আইএমএ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, রাজ্যের দুই সহ-সভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র ও কমরেড গৌরীশঙ্কর দাস। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আশাকর্মী, মিড ডে মিল রাঁধুনি ও সহায়ক দল, অঙ্গ নওয়াড়ি কর্মী, বিড়ি শ্রমিক, পুর স্বাস্থ্যকর্মী, নির্মাণ শ্রমিক, মোটরভ্যান চালক, ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার (কর্মবন্ধু), কমিউনিটি হেলথ গাইড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক সংগঠনগুলির ১১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের জেলা সম্পাদক হিসেবে কমরেড দীপক দাস অধিকারী এবং সভাপতি হিসাবে কমরেড বিশ্বনাথ প্রতিহার নির্বাচিত হন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 49 Bengali Weekly July 26, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

বিকল্প রাস্তার দাবিতে জয়নগরে অবরোধ
এস ইউ সি আই (সি)-র

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগর-জামতলা রোডের উপর বুড়োরঘাট সংলগ্ন কালভার্টটি সংস্কারের নামে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে শত শত বাস, অটো, টোটো, মোটর ভ্যান, ট্রেকার ইত্যাদি যায়। কিন্তু বিকল্প রাস্তার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে জয়নগর-২নং ব্লক ও কুলতলির সাথে জয়নগর প্রায় বিচ্ছিন্ন। সাধারণ মানুষকে প্রায় ১০-১২ কিমি ঘুরে জয়নগরে আসতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, রোগী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমেত সকলেরই যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। অবিলম্বে বিকল্প রাস্তার দাবিতে ১৮ জুলাই সকালে জয়নগর থানার মোড়ে এসইউসিআই(সি)-র ডাকে প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণকান্তি নস্কর ও কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও অবস্থান হয়। বিক্ষোভ চলার ১ ঘণ্টা পর পুলিশবাহিনী এসে প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার সমেত অন্যদের মারতে মারতে গ্রেপ্তার করে। কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস জেলা সম্পাদক বাপি মাইতি, মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস-এর জেলা ইনচার্জ সীমা পণ্ডা, ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদক ঋতুপর্ণা প্রামাণিক ও একজন পথচারী সমেত মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অশ্লীল ও কুৎসিত ব্যবহার করে। পুলিশের এই বর্বরতার খবর শুনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পার্টি কর্মী-সমর্থকরা জয়নগরে আসেন এবং বিকালে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয়। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু দ্রুত বিকল্প রাস্তার দাবিতে এবং পুলিশের অশালীন ব্যবহারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ার আহ্বান জানান।

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে নতুন যুক্ত হলেন ১৭ জন

১৬-২০ জুলাই অনুষ্ঠিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে যে তালিকা পেশ করা হয়, কেন্দ্রীয় কমিটি তা অনুমোদন করেছে। তার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কমরেডরা দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন—১) নিরঞ্জন নস্কর, ২) বিপ্লব চন্দ্র, ৩) শুভঙ্কর চ্যাটার্জী, ৪) জুবের রব্বানি, ৫) অংশুমান রায়, ৬) পিন্টু প্রতিহার, ৭) সন্তোষ ভট্টাচার্য, ৮) বাদল সরদার, ৯) মণি নন্দী, ১০) নেপাল মিত্র, ১১) সৌরভ ঘোষ, ১২) প্রদীপ চৌধুরী, ১৩) তুষার ঘোষ, ১৪) সুজিত পাত্র, ১৫) তুষার জানা, ১৬) গোপাল সাহু, ১৭) সজল বিশ্বাস।

এআইডিএসও-র উদ্যোগে ছাত্র সম্মেলন

মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে পঠন-পাঠন চালু, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার ব্যবস্থা বাতিল, সমস্ত শূন্যপদে দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, রাজ্যের ৮২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার অনুসারী রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোস্টেল ও ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও লাইব্রেরির সুবিধা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাসভাড়া এক তৃতীয়াংশ করা, এসসি, এসটি, ইডব্লিউএস ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি দাবিতে এআইডিএসও-র উদ্যোগে মহিষাদলে রবীন্দ্র পাঠাগার হলে ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হল দশম পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা ছাত্র সম্মেলন (ছবি) এবং ৭ জুলাই নারায়ণগড়ের খালিনা বাজারে অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র পশ্চিম মেদিনীপুর সপ্তম ছাত্র সম্মেলন।

মহিষাদল ঃ শুরুতে চার শতাধিক ছাত্রছাত্রীর সুসজ্জিত মিছিল সতীশ সামন্ত স্টেশন থেকে রবীন্দ্র পাঠাগারে আসে। শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ও উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) জেলা সম্পাদক প্রণব মাইতি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তনুশ্রী বেজ। সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও জেলা আহ্বায়ক নিরুপমা বক্সি। সম্মেলন থেকে শুভজিৎ অধিকারীকে সভাপতি, নিরুপমা বক্সিকে সম্পাদক করে ২৫ জনের জেলা কমিটি ও জেলা কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

নারায়ণগড় ঃ নারায়ণগড় ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের ৫০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রানিতা পড়িয়া, জেলা সভাপতি কমরেড সায়ন্তন ওঝা ও অন্যান্য নেতৃত্ব। মৌমিতা বাগকে সভাপতি এবং সনাতন মণ্ডলকে সম্পাদক করে ১৫ জনের শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস স্মরণে

প্রতিবাদী, আদর্শবান শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের শহিদ দিবস পালিত হয় ৫ জুলাই। মানবতার এই সংকটে বরুণ বিশ্বাসের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াকু চরিত্রকে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে নিয়ে যেতে 'বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি'র উদ্যোগে 'বরুণ পক্ষে' রাজ্য জুড়ে নানা কর্মসূচি পালিত হয়। এ দিন তাঁর স্কুল মিত্র ইনস্টিটিউশনের সামনে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন নাইয়া, নাট্যকর্মী ও বরুণ বিশ্বাসের সহশিক্ষক বিপ্লব নাহা বিশ্বাস, মিত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক, অভিভাবক, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররা।

১৪ জুলাই বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার পক্ষ থেকে পদযাত্রা, বরুণ চর্চা এবং ক্যারাটে ও যোগব্যায়াম শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে স্মৃতিরক্ষা কমিটি পরিচালিত ক্যারাটে-যোগব্যায়াম শিবিরগুলি থেকে প্রায় ৬৫ জন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। সকালে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা পৌরসভার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। শান্তি সংঘের শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী মেমোরিয়াল হলে আলোচনা সভা, ক্যারাটে প্রদর্শনী ও যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতা হয়। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক অমিত হালদার। এ ছাড়া ছিলেন কমিটির রাজ্য সংগঠক জ্ঞানতোষ প্রামাণিক ও অর্ক মালিক এবং রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক শিক্ষক অনাথ মৃধা। প্রধান আলোচক ছিলেন শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর (ছবি)। এরপর ক্যারাটে প্রদর্শনী ও যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতা হয়।

হাসপাতালে উপযুক্ত পরিষেবা সহ নানা দাবিতে রঘুনাথগঞ্জে মিছিল

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে কর্মসংস্কৃতি তলানিতে ঠেকেছে। এখনও পর্যন্ত ৬ হাজারের বেশি জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট ইস্যু করার কাজ বকেয়া পড়ে আছে। শিশু বিভাগ সহ সমস্ত বিভাগে পর্যাপ্ত পরিমাণে বেড নেই। অভিযোগ, বেশিরভাগ চিকিৎসক প্রাইভেট চেম্বারে ব্যস্ত। ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা মুমূর্ষু রোগীরাও আউটডোরে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকেন।

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৯ জুলাই এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে রঘুনাথগঞ্জ শহরে মিছিল করে এসডিও-র কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাঙা রাস্তা সারানো এবং দ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, সরকারি পুকুর ভরাট করার প্রতিবাদ জানানো হয়। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি রোধ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত করা, পুলিশের নাকের ডগায় চুরি ছিনতাই বন্ধ করা, টোটো চালকদের উপর থেকে পুলিশি হয়রানি বন্ধ, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি এবং তার অনুসারী রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, স্মার্ট মিটার বাতিল ও বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবি জানানো হয়।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন অনুরাধা ব্যানার্জী, সুব্রত মুখার্জী, সুমন পাল, লিয়াকত আলি, মোঃ মুসা ও বাবুল হালদার।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com